দৈনিক সংবাদ

12

তারিখ 03 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ও শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের করণীয়

এ বছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল গত সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকাস্থ শিক্ষা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেছেন।

এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চারটি শিক্ষাবোর্ড থেকে মোট ৩ লাখ ১৫ হাজার ৮৮৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭৮ হাজার ৪৫২ জন পরীক্ষায় পাস করেছে। অর্থাৎ সারা বাংলাদেশে গড়ে সিকিভাগ ছাত্রও এ পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। বস্তুত, চারটি বোর্ডের মিলিত ছাত্রছাত্রীর গড় পাসের হার ছিল মাত্র ২৪ দশমিক ৮৪ ভাগ।

এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল সমস্ত দেশকে স্তম্ভিত করেছে। ৩ লাখ ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৩৭ হাজারই যদি অকৃতকার্য হয় তবে স্তম্ভিত না হয়ে উপায়ই বা কি ? এ রকম ফল যে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের পরিবারবর্গকেই বিহবল করবে তাই না, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এমন প্রতিটি ব্যক্তিকেই বিচলিত করবে।

সবচেয়ে বিচলিত হওয়ার কথা ছিল শিক্ষা কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তাঁরা সমস্যাটার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বরং কথাবার্তা শুনে মনে হয় সমস্যাটাকে তাঁরা সমাধান হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন 'এবার কোন ছাত্র-ছাত্রী নকল করতে পারেনি বলেই পরীক্ষায় পাসের হার কম হয়েছে'।

শিক্ষামন্ত্রীর এ উক্তি শুনে মনে হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার শিক্ষা বিষয়ে তাদের মূল দায়িত্ব কি তা ভুলে গেছেন। ছাত্ররা নকল করার সুযোগ না পাওয়ায় বেশী সংখ্যায় ফেল করেছে--এভাবে বিষয়টা উপস্থিত করলে আসল সমস্যাটা চাপা পড়ে যায়। নকল করে কেউ পাস করুক এটা কোনক্রমেই কাম্য নয়। কিন্তু সবাইকে ফেল করিয়ে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? শিক্ষার প্রসার হবে, বা শিক্ষার মান বাড়বে? সমস্যাটা হল: শিক্ষা-দানের ব্যবস্থার অবনতি। ছাত্ররা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না বলেই নকল করে পরীক্ষা পাস করার চেষ্টা করে। কেন ছাত্ররা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা আর শুধুমাত্র ছাত্রদের উপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারব না। তখন সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা, কলেজে পড়াশোনার অবস্থা, শিক্ষকদের দায়িত্ব, শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্ব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এ সব প্রশ্ন এসে পড়বে। কিন্তু এতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, সমস্যার সমাধান করতে গেলে প্রথমে মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে। ভুল বিষয়কে আসল সমস্যা হিসাবে চিত্রিত করলে সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ সমস্যাটাই বিবেচনার আড়ালে থেকে যাবে।

পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার উচ্চহার মূল সমস্যা নয়, এটা মূল সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে মাত্র। যখন ৩ লাখ ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৩৭ হাজারই অকৃতকার্য হয়, তখন বুঝতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ রয়েছে, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এ কথাটাকে স্বীকার করে না নিয়ে, নকলপ্রবণতাকে মূল সমস্যারূপে বিবেচনা করলে, তার সমাধানকল্পে নকল বন্ধ করাতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে। তাতে নকল বন্ধ হতে পারে, ফেলের সংখ্যা বাড়তে পারে, কিন্তু শিক্ষার প্রসার বা মান বাড়বে না, শিক্ষিত জনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে না।

যদি আমরা স্বীকার করতে সম্মত থাকি যে স্কুল-কলেজে শিক্ষার অবনতিই নকল প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী তাহলে আমরা সমস্যার সমাধানকল্পে, নকল প্রতিরোধ করার পাশাপাশি, শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনেও ব্রতী হতে পারব। অপরপক্ষে, যদি পরীক্ষায় নকলের নিরিখেই সমস্যাটিকে বিচার করা হয়, তবে তার সমাধানকল্পে শিক্ষার দিকটি বাদ দিয়ে হয়তো পরীক্ষা পদ্ধতির প্রতিই মনোনিবেশ করা হবে। এটা কোন কাল্পনিক আশংকা নয়। ইতিমধ্যেই 'যথোপযুক্ত' বা 'বাস্তবসম্মত' পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করার কথা বলা হচ্ছে। তাতে পাস-ফেলের হার ইচ্ছামাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়তো যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে।

আমরা মনে করি, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার এত কম হওয়ার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সহজ ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করে বিষয়টাকে তলিয়ে বিচার করা প্রয়োজন।

আমরা মনে করি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ বছর এত অধিক পরিমাণ ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্য হওয়ার হয়তো আরো গুরুতর কারণ রয়েছে এবং সে সকল কারণ অনুসন্ধানে সরকারের তৎপর হওয়া উচিত। প্রথমতঃ নকল নিয়ে ও নকল বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এত কথা হয়েছে যে, শিক্ষাবোর্ডগুলো নিজ নিজ বোর্ডের পরীক্ষায় নকল হয়নি একথা প্রমাণের আগ্রহাতিশয্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাসের হার কমিয়ে দেখাতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, কলেজগুলোতে, এমনকি সরকারী কলেজেও হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি, লাইব্রেরী-গবেষণাগার তথা শিক্ষার সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। তৃতীয়তঃ এখন যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে তারা নতুন কারিকুলামে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর অধীনে যে সকল পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ ও আপত্তি বারবার উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষত বিজ্ঞান-বিষয়ক বই সম্পর্কে আপত্তি উঠেছে বেশী। অনেকেরই ধারণা, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের বর্তমান বই ও পাঠক্রমের তুলনায় আগেকার পাঠক্রম ও বই উন্নতমানের ছিল। এমন ধারণা তাই অমূলক নাও হতে পারে যে, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের প্রভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ না করার ফলেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারছে না।

এ অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে,উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকসমূহ অনাবশ্যক রকম বড়। এত বড় বই থেকে পাঠ্য বিষয়ের মর্ম উদ্ধার করা অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব হয় না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের নিকট থেকে যেটুকু সাহায্য পায় তা যে পর্যাপ্ত না সে কথা সুবিদিত। যে কয়েকজন ভাগ্যবান ও অর্থবান ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট বা কোচিং-এ পড়ার সুযোগ পায় তারাই পাস করে বা ভাল ফল করে। আমরা মনে করি,প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের হানি না ঘটিয়েও ছাত্রদের বোধগম্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সবশেষে আমরা বলব, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বা যে-কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা কোন বিচ্ছিন্ন বা পৃথক বিষয় নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘকাল কলেজে বা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। তবেই এক একটা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগলাভ করে। তাদের পেছনে দেশ, জাতি ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করা হয়। তাই নকল বন্ধ করে পরীক্ষায় ফেল করানোকে সাফল্যরূপে বিবেচনা করা যায় না। নকল না করেও ছাত্ররা যাতে পাস করতে পারে সে রকম প্রকৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন।